বাংলা ভাষা- বস্তুভিত্তি - বিষয় ও সমস্যা

রণেন ঘটক

বাঙালীর জাতীয়তাবোধ প্রসঙ্গে প্রথম সুবিন্যস্ত সংহত বিচারের তাগিদ ১৯০৪/৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালে প্রত্যক্ষ হল। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দেশাত্মবোধ-এর অবিসংবাদী প্রতীক এর অবস্থান থেকেই বঙ্গবিভাজনের প্রস্তাবের সোচচার প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় উপনীত হয়ে বাঙালীর জাতীয়তাবাদ এর সুষ্পষ্ট কাঠামোয় রং তুলি টানলেন। তুলিটি হল বিদ্রোহ আর প্রতিবাদ এর আর রং টি এলো গভীর বিস্ময়কর এক আবেগে মথিত হয় । বাঙালী সেই প্রথমবার সচেতনভাবে নিজের অবয়বে এক পরিপূর্ণতার আভাস দেখতে পেলো। বাঙালী জাতীয়তাবোধ প্রাণ পেলো। প্রাণ এলো বটে কিন্তু অবয়বের কাঠামো পূর্ণতা পেল কি? ধর্মনির্বিশেষে ভাষাচেতনাবোধ সম্পূর্ণ স্ফুরিত হল না।

এই জাতীয়তাবোধ এর কাঠামো

রীতিনীতি, আহারবিহার, সাংস্কৃতিক ধারা, ধর্ম, ভাষা— এই সমস্তগুলি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান করা গেলে তবেই জাতি হিসেবে এক জনগোষ্ঠীর স্বরূপ এবং তাৎপর্য বোঝা যেতে পারে। একইভাবে নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি বিশ্লেষণও জরী। খুব বেশী না হলেও এই কাজগুলিকে কয়েকজন বরেণ্য পণ্ডিত ও গুণী বাঙালী বেশ কিছুটা এগিয়ে দিয়েছেন। জনসচেতনতাবৃদ্ধির সঙ্গে ঐ অসমাপ্ত কাজগুলি দ্রুততর গতি পাবে।

উভয় বঙ্গেই বর্তমান স্ব স্ব গরিষ্ঠ অংশের চেতনায় বাঙালী জাতির স্পষ্ট identification (পরিচিতি নির্ণয়) সম্পর্কে কিছু ধোঁয়াশা আছে। সংশয় সবচেয়ে বেশী ধর্ম বনাম ভাষা প্রসঙ্গে। মুসলমান বাঙালী বনাম হিন্দু বাঙালী প্রসঙ্গ সম্ভবত সবচেয়ে গুত্বপূর্ণ। ভাষার প্রশ্ন ১৯শে মে ১৯৬১ তারিখে শিলচরে বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগারোজন ভারতীয় বাংলাভাষী শহীদ হলেন। এর তাৎপর্য অপরিসীম। তবু গৌণ হয়ে রয়েছে বহুজনের কাছে এই অধ্যায়টি আজও । কেন? বিশ্লেষণ দরকার। বছর দশেক আগেই হয়ে গেছে ঢাকায় সেই ঐতিহাসিক বাংলা ভাষার জন্য রক্তক্ষরা আন্দোলন। সেই আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠা প্রাণ গেলো আরো চার শহীদের। ২১শে ফেব্রুয়ারী। অসাধারণ এর তাৎপর্য। ধর্ম বনাম ভাষার অমীমাংসিত অগ্রাধিকারের প্রশ্ন যেন সমাধান যোগাত্য পেলো। সালাম, রফিক, বরকত, জববাররা- ধর্মে 'ইস্‌লাম' এই পরিচিতিকে ডিঙিয়ে ' বাঙালী' শব্দের মর্যাদাকে রক্তে ভূষিত করে অন্য এক বলিষ্ঠ ডাইমেনশনে তুলে আনলেন বাঙালী জাতিয়তাবোধকে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুটি ঘটনাই নজীরবিহীন। ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম বাঙালীর গৌরবজনক অধ্যায়।

ইতিহাস থেকে সমান্তরাল দৃষ্টিকোণে ঃ ধর্ম এবং ভাষা

হাজার পাঁচেক বছর এর এক জনগোষ্ঠী। তাদের মূল ভাষা- হিব্রু। ধর্ম- টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস অববাহিকায় উত্থিত তিন তিনটি প্রবল ভাবে উত্থিত ধর্মের মধ্যে প্রাচীনতম। ইহুদী ধর্ম। 'আব্রাহাম' বা 'মোজেস' - নিউটেস্টামেন্ট এ বর্ণিত বাইবেলেরও পূর্বসূরীর। আজ থেকে দুহাজার বছর আগে ঐ ধারাতেই সৃষ্ট হল খৃষ্ট ধর্ম। তারপর অধুনাতম, বলা যায় আরও প্রবল বেগে , উত্থিত ধর্ম- ইসলাম । নবীনতমও।

স্বভূমি থেকে উৎখাত হওয়া, কয়েক হাজার বছর ধরে স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, জার্মানী, রাশিয়া, সুদূর আমেরিকা- এমনকি এই ভারতবর্ষে অবধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য দুটো। এক, এরা স্বধর্ম ছাড়লো না। সিনাগগ্ অ

ার র‍্যাব্‌বাই রইল। দুই, প্রবল চাপে ইউরোপীয় অংশের কিছু মানুষ হিব্রু ও ইউরোপীয় ভাষার মিশ্রণে উদ্ভাবিত 'ইডিশ্' ভাষা গড়লো বটে কিন্তু প্রথম পাওয়া সুযোগেই হিব্রুকে ফের বসালো স্বমহিমায়। এখন নিজেদের রাষ্ট্র ইজরায়েল এ দুটি ধারার ভাষাই চালু থাকলেও ক্রমশ হিব্রু বলিষ্ঠতর ও গুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এটি ঘটানো হচ্ছে সজ্ঞানে সুপরিকল্পিতভাবে, স্বেচ্ছায় এবং ভালবাসায় । প্রসঙ্গত - হ্যাঁ, ইহুদী ধর্ম কেও তারা ছাড়েনি।

ধর্ম নিছক বিশুদ্ধ দার্শনিকতা নয়

ধর্ম বলতে শুধুমাত্র দার্শনিকতা, সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য সব কিছুর ব্যাখ্যা বিমূর্ত্তভাবে এরকম ধারণা আজ বজায় নেই কোথাও । ধর্মগুলি অদ্যাবধি মূলত আচরণবিধি, রীতিনীতি প্রকরণ ও অনুশাসনের কাঠামো নির্দ্ধারক হয়ে উঠেছে । ক্রমশ বেশী বেশী করে এই প্রবণতা বাড়ছে। তাই কোনও জনগোষ্ঠীর 'ধর্ম' অর্থে তাদের চালচলন, বেশভূষা, আচারানুষ্ঠান উৎসবের প্রথা প্রকরণ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির নিয়ন্ত্রক এক একটা মাপকাঠি (স্তুজস্তু ব্দব্ধনন্তুন্স) - যা বহুজন পালিত - এইসবই হয়ে উঠেছে । সেক্ষেত্রে অবশ্যই এর প্রভাব ভাষার উপর কতকাংশে হলেও বর্তাবেই। স্পর্শকাতর হয়ে ওঠা 'জল' ও 'পানি'র ঋজুতার বাধা অতএব আছে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেও। বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সংস্পর্শে নিজের হয়ে যাওয়া শব্দাবলী কালক্রমে উৎসের ইতিহাস হারিয়ে যেন ধর্মের আঁচল সংলগ্ন কিছু বৈষম্য মাত্র হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে- অন্তত বহুসংখ্যক অগভীরমনস্ক মানুষের কাছে। 'মৃত্যু' আর 'এন্তেকাল', 'কবর' আর 'দাহ', 'দোয়া' আর 'আশীর্বাদ' বা 'প্রার্থনা'— এদের উৎস ধর্মের অনুশাসন থেকে, না কি উৎসমুখের ধর্ম থেকে - সে তর্ক অসমাপ্ত আজও । ছুঁৎমার্গিতা প্রায় অনড় এখনও । মিলে যাওয়ার, মিশে যাওয়ার , বলিষ্ঠ হয়ে ওঠার পথে এ এক প্রবল অন্তরায়।

ভাষা এক সরীসৃপ

প্রশ্নটা শুধুমাত্র এখানেই কেন্দ্রীভূত নয়। একটু যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যের তল্লাশ করা যেতে পারে। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদরা জানাচ্ছেন যে কোনও ভাষা, ভাষামাত্রেই, - একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসর পার হতে হতে রূপ পাল্টায়। ডায়ালেক্ট বা উপভাষা এরাই। লক্ষ্য করা যাক বাংলা ভাষার কথা। নোয়াখালী বা চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্টবাসীদের বাংলা ডায়ালেক্ট এর পাশে সাজানো যাক বীরভূম, পশ্চিম বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়ার বাংলা ভাষার রীতি বা শব্দগুলিকে। মধ্যপথ হিসাবে থাকছে নদীয়া শান্তিপুর বা কলকাতার কথ্য বাংলা ভাষা। পার্থক্য এতই বিস্তৃত যে আসাম, মিথিলা, মানভূম বা ভদ্রকের (উড়িষ্যা) ভাষা, বা এমনকি নেপালী ভাষারও ধ্বনি, শব্দ বা উচ্চারণ রীতি প্রথমোত্তদের তুলনায়- কথ্য, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কলকাতার ভাষার অনেক কাছে মনে হতেই পারে। শিলেটি চাঁটগাই উপভাষা বনাম মৈথিলী- সঠিক স্থিত বিচারে বেশীরভাগ বাঙালী শেষেরটিকে নিকটতর ভাববেন। পাঠক মিলিয়ে দেখতে পারেন সত্যতা।

উৎসাহী বাঙালীর জন্য কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য

সাধারণ অথচ সচেতন হতে আগ্রহী বাংলাভাষীদের কারো কারো জন্য কয়েকটা খবর গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে ।

একঃ প্রায় সমগ্র উত্তর বিহার জুড়ে যে বিস্তীর্ণ মিথিলা অঞ্চল - সেখানে বিদ্যাপতির ভাষা- মৈথিলী-আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অবধি যে হরফে লেখা ও মুদ্রিত হত - তা বাংলা হরফ। প্রসঙ্গত, রাহুল সাংকৃত্যায়ণ বেশ বিরক্তি সহকারেই বলেছেন যে বিদ্যাপতি বাঙালী নন- এবং জানাচ্ছেন যে কোনও কোনও ''নাক উঁচু বাঙালী বুদ্ধিজীবির'' দাবী সত্ত্বেও (মন্তব্য - ' রাহুল' এর) - তিনি মৈথিলী। আমাদের বিচার্য সেটা নয়। বিদ্যাপতি আমাদের যথেষ্ট বোধগম্য এবং প্রিয় পাঠ্য- এটাই প্রাসঙ্গিক। বাংলা হরফে লেখা মৈথিলীর প্রাচীন সব পুঁথিপত্র পড়ে দেখলে সেগুলিকে দুর্বোধ্য নয়- বরং সহজবোধ্যই মনে হবে। মনে হতেই পারে যে পুলিয়া মানভূমের উপবাংলা ভাষার চাইতে কিংবা শ্রীহট্ট নোয়াখালীর ডায়ালেক্ট এর চাইতে ঐ মৈথিলী অনেক বেশী বাংলা। বোধ্য অনেক বেশী। শুনতে, বলতে বা বুঝতে।

দুইঃ একটি অসমীয়া বাক্য সংগ্রহ পুনরায় সামনে খুলে রেখে দেখা যাচ্ছে

ৰ ব র

(ক) হরফ বাংলা র অনুরূপ

(খ) বিভক্তি, প্রত্যয় ও অব্যয় এবং 'ৰ' 'ব' 'র' 'স' এর ব্যবহারিক বৈচিত্র্য ও উচ্চারণরীতিটুকু মেনে নিলে অসমীয়া শিখতে, বলতে ও বুঝতে যে কোনও ভাষাপ্রেমী বাঙালীর বড়জোর তিনমাস সময় লাগবে। হলফ করে বলছি।

তিনঃ (ক) বর্ণমালায় / হরফে ঐতিহাসিক কারণে কিছু অতিরিক্ত গোলাকৃতি রেখা সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও ওড়িয়া ভাষার মূল বর্ণমালার সঙ্গে বাংলা বর্ণমালার যথেষ্ট মিল। কিছু দেবনাগরীরও।

(খ) যেটুকু অমিল - হ্যাঁ- বেশ খানিকটা - তাকে মেনে নিয়ে ধ্বনি ও উচ্চারণ, শব্দ, ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ ইত্যাদি পদগুলোর প্রায় অবিকৃত মিল- লক্ষণীয়।

ওড়িয়া ভাষায় কথা বলতে ও বুঝতে যে কোনও উৎসাহী বাঙালীর সময় লাগবে বড়জোর দুমাস।

চারঃ মণিপুরের ভাষার গঠন, ধ্বনি ও পদবিন্যাসে খানিকটা দূরত্বব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও-হরফ অবিকল বাংলাই। একথা জানা ভালো।

পাঁচ ঃ প্রাক বিহার, বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত বিস্তৃত অঞ্চল মানভূম ও সিংভূমের সাধারণ কৌমভাষার অন্যতম বাংলা ভাষা। নিছক বাংলাই। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে গেলেও সিংভূম, মানভূম, পূর্ণিয়া অঞ্চলের যে কোন রেজিষ্ট্রার এর দফতরে রক্ষিত জমিজমা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্রের দলিলের মূল কপিগুলি বাংলা ভাষায় বা তৎকালীন আদালতীয় ভাষায় (অর্থাৎ উর্দু শব্দ সহযোগে-বাংলা হরফে-যেমন মোতাবেক ইত্যাদি) রচিত। খুঁজে দেখতে আজও কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। অবশ্য যদি ইতিমধ্যে সব মূল দলিল ইত্যাদি লোপাট না হয়ে গিয়ে থাকে।

ছয়ঃ ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সময় হিন্দী 'প্রোটাগনিষ্ট'দের হঠাৎ বোধোদয় ঘটে গেল। ওদের সমস্ত শাসনযন্ত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল। পঃ বঙ্গ সংলগ্ন মানভূম, সিংভূম, ধলভূম জেলাগুলির গরিষ্ঠসংখ্যক বাংলাভাষাভাষীদের হিন্দী ভাষী ঘোষণা করানো হল। অন্যত্র সেই সঙ্গেই বদলে দেওয়া হল হরফ। বাংলা নয়, দেবনাগরী হরফে রূপান্তরিত হয়ে গেল তৎপরবর্তী সময়ের ছাপা মৈথিলী ভাষাও। উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। ভাষাগত আগ্রাসন। যার পিছনে ছিল এক ধরনের সম্প্রসারণবাদ । Expansionism বর্তমান প্রজন্মের বাঙালী এসব প্রত্যক্ষ করেনি। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া ভালো।

আরও কিছু ভাববার, মনে রাখবার মত কথা

পৃথিবীর পঞ্চম বহুলতম প্রসারিত ভাষা- 'আ-মরি বাংলা ভাষা'। ঠিকঠাক ধরলে ২৫ থেকে ২৬ কোটি মানুষের ভাষা। হিন্দুস্থানী হিন্দীর সংখ্যার চেয়ে কম নয় আসলে। খাতার হিসেব যাই হোক। গুজরাটি, রাজস্থানী, মগাহী, মৈথিলী বা এমনকি ভোজপুরীও — ঐ হিন্দীর ধারে কাছে নয়। এসব বিচার করতে বসলে জনা কয়েক সুনীতি চাটুজ্জে, নীহার রায়, সুশোভন সরকার বা নিশীথ সেনগুপ্ত চাই। তবে- দিল্লীর তখ্‌তটা ভীষণ গোলমেলে। শুধু বৈদগ্ধ্যে ঐ পাহাড় নড়ানো অসম্ভব।

ভাল রক্ত চলাচল সুস্বাস্থ্য রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়

খুব যেটা জরী তা হল দুই বাংলার মাঝের সাঁকোটাকে শক্ত পোক্ত কংক্রীটের প্রশস্ত সেতু বানানো । সেই সেতুর চওড়া বুকে থাকা চাই অনেকগুলো সমান্তরাল বা পাশিপাশি পথ - স্কন্দ। ধরা যাক একটা তার ধর্মের, একটা বৈচিত্র্যের, একটা লোকায়ত রসায়নের, একটা মননের বৈদগ্ধ্যের, এরকম আরো কটি । মূল কাজ পারাপার। দুপাশের কর্মকাণ্ড তথা চেতনার স্বচ্ছন্দ অবাধ প্রাণবন্ত আদান প্রদান। 'জল' এবং 'পানি' মিলিয়ে যোগানো হোক সকলের জন্য সেরা জলপানি। শাহরিয়ার কবির, শামসুর রাহমান, রেজওয়ানা চৌধুরী (বন্যা) আর ফিরোজা বেগমদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলুন সুচিত্রা মিত্র, অন্নদাশংকর রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়- রা। একসঙ্গে সবাই প্রাণখুলে হাসুন, লিখুন, কথা বলুন, গান হোক — গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, তরজা থেকে কবিগান, ভাটিয়ালি থেকে বাউল , রবীন্দ্রনাথ থেকে আববাস উদ্দীন। হীরা পান্না জহরৎ উঠে আসুক। সরাসরি দুটো ধর্মকে পাশ কাটানো এক্ষুণি অসম্ভব। ধর্ম নিয়ে যারা পাশা খেলে আর

তাদের পিছনে কলকাঠি নাড়েচাড়ে যারা তাদের ফাঁদে অবশ্যই পা দেয়া নয়। বরং তাদেরই আহাম্মক বানিয়ে তোলা সম্যক কাজ এবং এ কাজটা প্রয়োজনীয়। বাংলা তথা বাঙালীর দুপাড়েরই - এটা সম্ভবত অনিবার্য প্রাথমিকতা।

বন্ধ্যা বাহাদুরীর ন্যাকামী স্তব্ধ হোক

আর একটাই কথা। এটাও নিতান্ত জরুরী। ভাষা কারো পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। অথচ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিরা এরকম একটা প্রমাদে ভুগছেন- অনেক কাল ধরে, অনেকে। সবাই নয়। মাণিক বাড়ুজ্জে 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'নেকী' লেখেন যে স্বচ্ছ মানসিকতায়- তাকেও ছাপিয়ে যেতে হবে। হবেই। চালু বাংলা ভাষায়- কলকাতাকেন্দ্রিকতা- এই বঙ্গে- চোদ্দো আনা। এটাকে কমিয়ে আট আনার নীচে নামাতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকার অস্পৃশ্যপ্রায় ডায়ালেক্ট সমৃদ্ধ কয়েক কোটি বাঙালীকে এই সমুদ্র মন্থনে যোগ দেওয়াতে হবেই। লোকায়ত কথাটা নিছক কেতাবী বা বৈঠকখানাকেন্দ্রিক নয়। এটাই প্রাণের কথা। প্রাণ প্রবাহ লোকায়ত না হলে আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। ইটো জরী বটে, ই কাজটো।

এক সতর্ক সাবধানবাণী শোনানো ভালো । কিছু অগভীর পল্লবগ্রাহী নরনারী- লোকগান, লোকভাষা - উপভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নাগরিক স্টেজে যে মেকী ন্যাকামো করছেন- তা প্রচণ্ড শাসনে স্তব্ধ করে বলা হোক - যথেষ্ট হয়েছে, থামো।

প্রয়াত অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এর রক্তে মজ্জায় ঢুকে ছিল বাঁকুড়া 'পুল্যা'র ভাষা- সংস্কৃতি-চেতনা। তিনি নাটকে ঐ ধরনের আঞ্চলিক ভাষায় যথার্থ সংলাপ বলেছেন। অথচ আরো কেউ কেউ খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিজেদের কিছুমাত্র শিক্ষিত না করেই - ঐ প্রচেষ্টা চালিয়ে- সর্বনাশ করেছেন এবং নিজেরাও হাস্যস্পদ হচ্ছেন। এদের জন্য বলছি- অবিলম্বে গেট্ আউট্। বালখিল্য হয়েও এদের স্পর্ধা অপরিসীম। এইসব জঞ্জাল সাফ জরুরী।

বিদগ্ধ গবেষকের সতর্কবার্তা

ভাষার সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে থাকে। থাকুক। মননশীলতাও সঙ্গে চাই। বিশ্লেষণধর্মী, যুক্তিপ্রবণ চেতনা ভাষাকে বলিষ্ঠ রাখে। শ্রদ্ধেয় নীহার রঞ্জন থেকে উদ্ধৃতি সহ শেষ করছি ঃ

"নানা রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে, ব্যক্তি, বর্ণ ও শ্রেণী স্বার্থবুদ্ধির প্রেরণায় সমাজদেহ যখন ভিতর হইতে ক্রমশ পঙ্গু ও দুর্বল হইয়া পড়ে ..... জীবন প্রবাহ তখন আর স্বচ্ছ সবল থাকে না, মবালুরাশির মধ্যে তাহা দ্ধ হইয়া যায়, অথবা পঙ্কে পরিণত হয় .... বিবর্তনের যুক্তিও তখন আর সক্রিয় থাকে না; বস্তুত, দান ও গ্রহণের, সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণের যে যুক্তি বিবর্তনের গোড়ায়, অর্থাৎ বিবর্তনের যাহা জৈব নিয়ম তাহা পালন করিবার মত শক্তিই তখন আর সমাজ দেহে থাকে না। ....ইহা বিপ্লবের ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিত দেখিবার ও বুঝিবার মত বুদ্ধি ও বোধ থাকা প্রয়োজন। নহিলে ইঙ্গিত ইঙ্গিতই থাকিয়া যায়, সময় বহিয়া যায়, বিপ্লব ঘটেনা।"

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com